চার্চের (Eastern Orthodox Church) প্রতি। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বিনাশের পর এই চার্চের সবচেয়ে বড় ধারক ছিল রাশিয়া। আবার রাশিয়া ছিল সবচেয়ে বড় স্ল্যাভ রাষ্ট্র। ফলে বলকান অঞ্চলের বিভিন্ন মানুষ ও দেশগুলির প্রতি রাশিয়ার একটা প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ছিল। রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের বিরোধের অনেক কারণের মধ্যে এটাও ছিল অন্যতম। ১৮৯০ এর দশক থেকে যখন জার্মানি অটোম্যান সাম্রাজ্যকে মদত দিতে শুরু করল তখন থেকে বলকান জাতীয়তাবাদকে রাশিয়াও গোপন সমর্থন জানাতে লাগল। কাইজার দুবার তুরস্ক ভ্রমণ করার ফলে তুর্কী-জার্মান দেয়া-নেয়া বাড়ছিল। স্থির হয়েছিল যে জার্মানির সহায়তা ভিয়েনা, বুদাপেষ্ট, কনস্টান্টিনোপল হয়ে বসরা পর্যন্ত একটি রেললাইন পাতা হবে যে লাইন ইউরোপের বার্লিনকে যুক্ত করবে বাগদাদের সঙ্গে। এই রেল ব্যবস্থা সফল হলে পূর্ব দিকে জার্মানির প্রভাব বাড়ত এবং সুয়েজখালের বিকল্প রাস্তা খুলে দিয়ে পূর্ব পশ্চিম যোগাযোগের চাবিকাঠি ইংল্যান্ডের হাত থেকে জার্মানির হাতে চলে যেত। এইভাবে যখন সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতার ভয় ইংল্যান্ড গ্রাস করল তখনই ১৯০৮ সালে—তুরস্কে সংগঠিত হল তরুণতুর্কী বিপ্লব (Young Turk Revolution)। তৎক্ষণাৎ এই বিপ্লবের ফলে বেসামাল তুরস্কের সাময়িক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে বিপ্লবের তিন মাস পরে বুলগেরিয়া (Bulgaria) স্বাধীনতা ঘোষণা করল। বুলগেরিয়ার পেছনে রাশিয়ার মদত ছিল বলে তুরস্ক কিছুই করতে পারল না। তুরস্ক হয়ত অস্ট্রিয়ার সাহায্য নিতে পারত কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার দুদিন পরে অস্ট্রিয়ার বসনিয়া (Bosnia) হার্জেগোভিনা (Harzegovina) দখল করে নিল। এই কাজের দ্বারা দুটি দেশই ১৮৭৮ সালের বার্লিন চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করল। কারণ এই চুক্তিতে বলা ছিল যে শেষোক্ত দুটি দেশের প্রশাসন থাকবে অস্ট্রিয়ার অধীনে। হয়ত ১৯০৮ সালের ঘটনাবলী নিয়েই যুদ্ধ বেধে যেতে পারত। কিন্তু ১৮৭৮ সালের বার্লিন চুক্তির স্বাক্ষরকারীরা কেউই প্রস্তুত ছিল না। সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত রইল।

অস্ট্রিয়াার বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল বলকান অঞ্চলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এই দুই অঞ্চলের মানুষ জাতিগতভাবে সার্বদের (Serbs) অন্তর্ভুক্ত মানুষ ছিল। আর সার্বরা অনেকদিন ধরই এক 'বৃহত্তর সার্বিয়া' (Greates Serbea) গঠনের স্বপ্ন দেখছিল। মূল সার্বিয়া ও পরিপার্শ্বের সমস্ত সার্বদের নিয়ে এই বৃহত্তর সার্বিয়া গঠনের পরিকল্পনা অনেকদিন ধরেই চালু ছিল। অস্ট্রিয়ার বসনিয়াও হার্জেগোভিনা দখলের ফলে এই বৃহত্তর সার্ব রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে এর পর থেকে ইউরোপীয় মহাদেশের এক কেন্দ্রীয় শক্তি—অস্ট্রিয়া—যে কোন সার্বসম্প্রসারণের নীতিকে প্রতিরোধ করবে। এর ফলে বলকান অঞ্চলের মানুষদের অস্ট্রিয়ার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেল। বলকান জাতীয়তাবাদ আরও তীব্রতর হল। স্বাভাবিকভাবেই অস্ট্রিয়া ও তার শাসকবর্গ সম্বন্ধে নানা উত্তেজনাকর মত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নতুন করে ষড়যন্ত্রের বীজ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এর পর থেকে স্পষ্ট করেই বলকান জাতীয়তাবাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াল একদিকে অস্ট্রিয়া, অন্যদিকে তুরস্ক। তুরস্কের বিরুদ্ধে বলকান জাতীয়তাবাদের উত্থান আঞ্চলিক যুদ্ধডেকে এনেছিল— তা হল ১৯১২ ও ১৯১৩ সালের বলকান যুদ্ধ। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বলকান বৈরিতা ডেকে এনেছিল বৃহত্তর যুদ্ধ—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

৪.৪.৫ আন্তর্জাতিক সংকটঃ হেগ কনফারেন্স থেকে বলকান যুদ্ধ

১৮৭০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে যে অধ্যায় তা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে অনিশ্চিত অধ্যায়গুলির মধ্যে একটি। আপাতভাবে বিরাজমান শান্তির মধ্যে ছিল প্রত্যাসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কা। যে বৈজ্ঞানিক পূর্ণতা ও সাফল্য (scientific throroughness and efficiency) নিয়ে এশিয়ার সামরিক যন্ত্র তৈরি হয়েছিল যা জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল তা ইউরোপের প্রত্যেক দেশের মধ্যে যুগপৎভাবে উৎসাহ ও আশঙ্কা জাগিয়ে তুলে আন্তর্জাতিক সংকটের বাতাবরণকে ঘনীভূত করে তুলেছিল। সবাই উৎসাহিত হয়েছিল তাদের সামরিক শক্তিকে নবকলেবরে সুসজ্জিত করতে,

বৈজ্ঞানিক পূর্ণতায় নিজেদের বাহুবলকে এমন দক্ষতা দিতে যা ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। একজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে উনিশ শতকের শেষ সিকিভাগ সময়ে ইউরোপে আগে যা হয়নি তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল—আক্ষরিক অর্থেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি সশস্ত্র মহাদেশ ("Europe became in the last quarters of the nineteenth Century what she had never been before, literally an armed continent"–Charles Oman Hazen, Modern Europe upto 1945)। জাতির সঙ্গে জাতির বৈরিতার থেকে জন্ম নিচ্ছিল ভিন্ন এক প্রতিযোগিতা—মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা, দুর্ভেদ্য নৌবহর ও শক্তিশালী সামরিক মানবশক্তি গড়ে তোলার ব্যবস্থা। তৈরি হচ্ছিল মারণাস্ত্র ক্ষেপণাস্ত্র—টর্পেডো ও টর্পেডো-বাহী জলযান—আর তৈরি হচ্ছিল সেই সব ক্ষেপণাস্ত্রকে আড়াল থেকে অকেজো করার যন্ত্র, জলের তলে আক্রমণ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় জলযান সাবমেরিন। এর পরেই এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল অন্তরীক্ষে লড়াইয়ের যন্ত্র চালানো যায় এমন বেলুন (dirigible balloons) ও বিমান। এইভাবে যুদ্ধ নামক মানুষের প্রাচীনতম প্রবণতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নতুন সমর্থন যুক্ত হতে লাগল। এইবার যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল তা অভূতপূর্ব। এতদিন যুদ্ধ হয়েছে মাটি বা জলের উপর। এবার যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল আকাশে ও জলের নীচে, গভীরে, গহনে। ইউরোপে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রাষ্ট্র ছিল রাশিয়া। সামরিক শক্তিকে আধুনিকীকরণের কাছে লিপ্ত হওয়ার ক্ষমতা রাশিয়ার ছিল ন কারণ সে কাজ ছিল ভয়ানক ব্যয়সাধ্য। অতএব রাশিয়ার মনেই এই ধারণা প্রথম এল যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার থেকে যুদ্ধকে প্রতিরোধ করা, পূর্বাহ্নেই প্রস্তুতি নিয়ে তাকে এড়িয়ে যাওয়া অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। অতএব রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস প্রস্তাব করলেন যে পরস্পরের আলোচনার ভিত্তিতে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি অস্ত্রসংকোচনের নীতিগুলি নির্ধারণ করুক। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী ১৮৯৯ ও ১৯০৭ সালে হেগ নামক স্থানে দু'বার শান্তি সম্মেলন হয়েছিল। প্রথমবারের সম্মেলনে পৃথিবীর ছাব্বিশটি সার্বভৌম সরকারের একশত জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে ২০টি দেশ হল ইউরোপের ৪টি দেশ (চীন, জাপান, পাসিয়া বা পারস্য দেশ এবং শ্যাম দেশ) এশিয়ার ও ২টি (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো) দেশ আমেরিকার। এই সম্মেলন দুটি ব্যর্থ হয়েছিল। শুধু প্রথম সম্মেলন থেকে সৃষ্টি হয়েছিল স্থায়ী সালিসী আদালত—Permanent Court of Arbitration–নামে একটি আন্তর্জাতিক বিচার সংস্থা। স্থির হল যে আন্তর্জাতিক বিবাদ সাধারণ কূটনীতির দ্বারা মীমাংসা করা সম্ভব নয় তা এই বিচার সংস্থার দ্বারা মীমাংসিত হবে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রেনে আলব্রেকাত -করিয়ে (Rene Albrecht -Carrie', A Diplomatic History of Europe Since the Congress of Vienna) বলেছেন যে অস্ত্র সংকোচন নিয়ে আহূত প্রথম হেগ শান্তি সম্মেলন সালিসী ব্যবস্থা নিয়ে সংক্ষিপ্ত মতৈক্য ছাড়া আর কিছুই আয়ত্ত করতে পারেনি ("This first Hague conference on the limitation of armaments yielded nothing more than a limited agreement on arbitration.")। দ্বিতীয় হেগ সম্মেলন ও অস্ত্রসংকোচনের কোন নীতি স্থির করতে পারল না। যুদ্ধ সংক্রান্ত কতগুলি নীতি শুধু স্থির হয়েছিল যেমন অরক্ষিত শহরের (unfortified towns) উপর বোমাবর্ষণ করা যাবে না। অর্থাৎ দ্বিতীয় হেগ শান্তি সম্মেলনের একমাত্র কৃতিত্ব হল যুদ্ধকে একটু মানবিক সীমার মধ্যে আটকে রাখা—একজন ঐতিহাসিকের ভাষায় "to ensure that war would be waged more humanely than hitherto"। রাশিয়ার জার দুঃখ করে বলেছিলেন যে শান্তি সংরক্ষণকেই আন্তর্জাতিক নীতির লক্ষ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। অথচ এর নামে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে শক্তিশালী মৈত্রী রচনা করছে ("The preservation of peace has been put forwarded as the object of international policy. In its name the great States have concluded between themselves powerful alliance")। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির কাছে তখন শান্তির কথা হাস্যকর হয়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক লিপসন বলেছেন যে মহাদেশের প্রধান প্রধান শক্তিগুলি একটা বিষাক্ত চক্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। তারা সবাই শান্তির ঘোষণা করত কিন্তু ভয় পেত প্রতিবেশীকে—ভাবত অস্ত্রের পর অস্ত্র জড়ো করে

প্রতিবেশী রাষ্ট্র সবল হচ্ছে। এই আশঙ্কায় প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজের শক্তিবৃদ্ধি করার চেষ্টা করত। এই পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে—রাশিয়ার জার দুঃখের সঙ্গে লিখলেন—তবে অনিবার্যভাবে সেই বিপর্যয় নেমে আসবে যে বিপর্যয় এড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। ("It appears evident, then that if this state of things continues, it will inevitably lead to the very cataclysm which of is desired to avert, and the horrors of which make every thinking being shudder in anticipation"— দ্রষ্টব্য Holls, The Peace Conference at the Hague, p. 8) । ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে পারল না তার অর্থই হল অন্তরালে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠেছিল। এইরকম আসন্ন যুদ্ধের পূর্বাভাস দেখা দিয়েছিল দুবার—১৯৩৬ ও ১৯১১ সালে মরক্কোর সংকটে এবং ১৯১২ ও ১৯১৩ সালের বলকান যুদ্ধে। এই দুই সংকটের ইতিহাস সংক্ষেপে নীচে আলোচনা করা হল।

মরক্কোর সংকট, ১৯০৬, ১৯১১

ফরাসীরা ১৯০২ সালে ইটালীর সংগে তাদের চুক্তির দ্বারা এবং ১৯০৪ সালের ইংল্যান্ডের সঙ্গে তাদের আঁতাতের দ্বারা মরক্কোতে (Morocco) স্বাধীনভাবে হস্তক্ষেপের অধিকার পেয়েছিল। এবার তারা স্থির করল যে মরক্কোর সুলতানকে একটি সংস্কারের কর্মসূচী (scheme of reforms) গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। তৎক্ষণাৎ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এই বৃহত্তর কাজে জার্মানিকে গ্রহণ না করায় ক্ষুব্ধ হয়ে মরক্কোর স্বাধীনতা রক্ষায় জার্মানির সহযোগিতা ঘোষণা করলেন। ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে তিনি ট্যাঙ্গিয়ারে (Tangier) ভ্রমণকালে এই ঘোষণা করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দাবি করেন যে মরোক্কোর ভাগ্য নির্ধারণের জন্য ইউরোপীয় রাজ্যগুলি একটি আলোচনা সভায় মিলিত হোক। এদিকে মরক্কোর সুলতান জার্মানির সহযোগিতায় আশ্বস্ত হয়ে ফরাসী সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তখন ইউরোপীয় শক্তিগুলি ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে আলজেসিরার্স (Algeriras) নামক স্থানে একটি আলোচনা সভায় স্থির করে যে মরোক্কো হবে একটি স্বাধীন রাজ্য, কিন্তু বাণিজ্যের জন্য সমস্ত জাতির মানুষের কাছে তাকে উন্মুক্ত রাখা হবে। বারেটি রাষ্ট্র এই আলোচনা সভায় অংশ নিয়েছিল,তাদের মধ্যে শুধু অস্ট্রিয়াই ছিল জার্মানির বন্ধু। আলজেসিয়ার্স সম্মেলনে সিদ্ধান্ত কি হয়েছিল তা বড় নয়। বড় হল তার থেকে উদ্ভূত এই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা যে জার্মানি নিঃসঙ্গ। বোঝা গেছিল যে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি জার্মানির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে তার আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিরোধ করতে পারে। জার্মানির কাইজার এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে বুঝতে পারেনি।

মরোক্কোর ঘটনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বড় ঘটনা কারণ তা ফ্রান্স ও জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী চেতনাকে উস্কে দিয়েছিল। আসলে মরোক্কো ছিল অটোমান সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় স্বাধীন একটি রাজ্য যেখানে পরিস্থিতি ছিল বেসামাল —এতই বেসামাল যে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স ও জার্মানি তাকে গ্রাস করার কথা ভাবত। মরোক্কোয় অবস্থানরত ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল (Consul General) আর্থার নিকোলসন (Arthur Nicloson) বলেছিলেন যে মরোক্কো হচ্ছে "উত্তাল উপজাতিদের, দুর্নীতি পরায়ণ শাসকদের এবং দারিদ্র ও দুর্দশার একটি অসম্বদ্ধ সম্মেলন" (a "loose agglomeration of tribulent tribes, corrupt governors and general poverty and distress") । এইরকম মরোক্কোতে ১৯০৮ সালে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য সেখানকার সুলতান সিংহাসন-চ্যুত হলেন। নতুন সুলতান দেশের ভেতরের গোলযোগ দমন করতে ব্যর্থ হয়ে ১৯১১ সালে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র আলজেরিয়াতে (Algeria) অবস্থিত তার মিত্রশক্তি ফরাসীদের আহ্বান জানালেন যে তারা যেন তাঁর রাজধানী ফেজ-এ (Fez) এসে তাঁর নিরাপত্তা বিধান করে। ফরাসিরা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তৎক্ষণাৎ তারা ফেজ-এ তাদের সৈন্য প্রেরণ করে। এই ঘটনায় জার্মানি ক্রুদ্ধ হল। রুষ্ট কাইজার তৎক্ষণাৎ মরোক্কোর বন্দর আগাদির-এ (Agadir) প্যান্থার নামে একটি যুদ্ধ জাহাজ (Panther) প্রেরণ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কৌশলে মরোক্কোর গুরুত্বপূর্ণ বন্দরটি দখল করা। আর তা সম্ভব না হলে অন্তত ফ্রান্সকে মরোক্কোয় নিজের প্রভাব বিস্তার করা থেকে

বিরত করা। জার্মানির এই কাজে ইংল্যান্ড বিরক্ত হল এইভেবে যে জার্মানি তার নৌ-বহিনীর পরাক্রম দেখিয়ে এমন অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করছে যেখানে ইংল্যান্ডের স্বার্থ জড়িত। জার্মানির নৌ-পরাক্রমকে ইংল্যান্ড মহাসমুদ্রে জার্মানির প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলে মনে করত। অতএব আগাদির এ জার্মান রণতরীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডের লয়েড জর্জ (Lloyd George) ঘোষণা করলেন যে বহুশতাব্দীর -দুর্লভ কৃতিত্বের দ্বারা ইংল্যান্ড যে সমস্ত সুবিধা অর্জন করেছে তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে, বিশ্বের রাষ্ট্র সমাজে ইংল্যান্ডকে উপেক্ষিত হতে হলে ইংল্যান্ড কখনোই সেই মূল্য দিয়ে শান্তি ক্রয় করবে না ("...I say emphatically that peace at that price would be humiliation intolerable for a great country like ours to endure")। এইভাবে হঠাৎ করে একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখা দিল। ফলে সন্ত আলজেসিয়ার্স কনভেনশনভুক্ত (Algeciras Convention) দেশগুলির মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু হল। পরিশেষে স্থির হল যে মরোক্কোকে ফরাসী প্রটেক্টরেট (French Protectorate) বলে স্বীকার করে নেওয়া হবে কিন্তু সকল দেশের বাণিজ্যের জন্য তাকে উন্মুক্ত রাখা হবে। জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফ্রান্স কঙ্গো অঞ্চলে ভূখণ্ডদান করবে। জার্মানি আগাদির সংকট তৈরি করে কূটনৈতিকভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন (David Thompson, Europe since Napoleon) বলেছেন যে আগাদির সংকটের প্রধান ফল হল এই যে ইঙ্গ-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মহাসাগরে আধিপত্য বজায় রাখার প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেল, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবিশ্বাস বাড়ল। উভয় দেশের জনমত উত্তেজিত রইল। জার্মানি কঙ্গোতে ১০০০ বর্গমাইল ভূখণ্ডলাভ করল। বেশ বোঝা গেল যে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শেষ হয়ে যায়নি।

২. বলকান যুদ্ধ ঃ ১৯১২, ১৯১৩

১৯১২ সালে গ্রীক রাষ্ট্রনেতা ভেনিজেলস (Venezelos) একটি রাষ্ট্র সংহতি গঠনের উদ্যোগে নেন এবং গ্রীস, সার্বিয়া (Serbia), বুলগেরিয়া (Bulguria) ও মন্টেনিগ্রোকে নিয়ে বলকান লীগ নামে একটি রাষ্ট্র জোট গঠন করেন। এই লীগের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের কাছ থেকে ম্যাসিডেনিয়ায় অবস্থিত খ্রীষ্টানদের জন্য অধিকতর সুবিধা এ অধিকার আদায় করা। ১৮৭৮ সালের বার্লিনচুক্তি অনুযায়ী ম্যাসিডোনিয়া তুর্কী শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব বলকান লীগ তুরস্কের কাছে সরাসরি এই দাবী পেশ করল।

বলকান রাষ্ট্রগুলি কেন এই সময়ে জোট বাঁধল এবং তুরস্কের সঙ্গে সরাসরি বৈরিতায় অগ্রসর হল তার একটি প্রেক্ষিত আছে। ১৯১১ সালে ইটালী ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ অঞ্চল ট্রিপোলি (Tripoli) আক্রমণ করে এবং বহু কষ্টের মধ্য দিয়ে তাকে নিজের দখলে রাখে। দুর্বল অটোমান সাম্রাজ্য নিজের রাজ্যাংশ রক্ষা করতে না পেরে অবশেষে ১৯১২ সালের ১৫ অক্টোবরলোসনা চুক্তির (Treaty of Lausanne) বা ঔচি-চুক্তির (Treaty of Ouchi) দ্বারা ট্রিপোলিকে ইটালীর হাতে সমর্পণ করে। ইটালী টিউনিস (Tunis) দখল করতে পারেনি, তার আগেই ফ্রান্স তা দখল করে নিয়েছিল। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ড মিশর দখলের কাজ সম্পন্ন করে ফেলছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল করে নিয়েছিল। ১৯০৮ সালে বুলগেরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। কোন ক্ষেত্রেই দুর্বল অটোমান সাম্রাজ্য কোন প্রতিরোধ দিতে পারেনি। এমনকি কোন বৃহৎ শক্তিও এই তুর্কী সাম্রাজ্য ধসে যাওয়া প্রতিরোধ করতে নিজেদের প্রতিরক্ষা বা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি। অতএব এটাই ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের উপর চাপ সৃষ্টি করার প্রকৃষ্ট সময়।

এই পরিস্থিতিতেই বলকান লীগ তুরস্কের কাছে ম্যাসিডোনিয়ার খ্রীষ্টানদের জন্য অধিকতর সুযোগ-দাবি করল। দীর্ঘদিন ধরে ম্যাসিডোনিয়ার খ্রীষ্টান অধিবাসীদের উপর নির্মম অত্যাচার করছিল অটোমান সাম্রাজ্যের মুসলমান শাসকরা। সময় সময় বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হত। আর এই হত্যালীলায় যারা বলি প্রদত্ত হত তাদের মধ্যে গ্রীক, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ইত্যাদি জাতিভুক্ত মানুষরাই ছিল বেশি। অতএব এই দেশগুলির মানুষেরা চাইছিল মন্টোনিগ্রোতে

অবস্থিত তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের উদ্ধার করতে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তুরস্কের কাছে তাদের দাবি পেশ করা হয়েছিল। এই দাবি তুরস্ক সরাসরি অস্বীকার করে। ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে বলকান লীগভুক্ত রাষ্ট্র চতুষ্টয় তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। লীগের সেনাবাহিনী কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করল। ডিসেম্বর মাসে বৃহৎ শক্তিগুলি হস্তক্ষেপ করে লন্ডনে একটি সম্মেলনের আয়োজন করল। কিন্তু শান্তিচুক্তির যে শর্তাবলী বৃহৎ শক্তিগুলি তুরস্কের উপর আরোপ করছিল তা মেনে নিতে তুরস্ক অস্বীকার করল। ফলে ১৯১৩ সালে আবার যুদ্ধ শুরু হল এবং লীগের সৈন্যবাহিনী পুনরায় কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করল। ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে জোট বাহিনী কনস্ট্যান্টিনোপলের (Constantinople) পঁচিশ মাইলের মধ্যে চলে এল। কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের আশঙ্কায় তুরস্ক তার সমস্ত ইউরোপীয় রাজ্যাংশ হারাল। তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া রাজ্যাংশ বলকান রাষ্ট্রগুলিকে দান করাহল। আলবেনিয়াও এরপর থেকে একটি স্বাধীন-রাষ্ট্রে পরিণত হল। সার্বিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও আলবেনিয়াকে স্বাধীন করা হয়েছিল। সার্বিয়া অনেকদিন ধরেই একটি উপকূল রেখা চাইছিল যাতে একটি অভ্যন্তর রাষ্ট্র (island state) হিসাবে তার বদ্ধ দশা ঘোচে। তাই তার ইচ্ছা ছিল সে এবং মন্টেনিগ্রো উভয় মিলে আলবেনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাতে বাদ সাধল অয়া কারণ 'বৃহত্তর সার্বিয়া' গঠিত হোক তা সে চাইছিল না। ক্ষুণ্ণ সার্বিয়ার জনগণ এরপর থেকে অস্ট্রিয়ার প্রতি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে ওঠে। স্বদেশের বাইরেও সার্বদের মধ্যে ক্ষোভ ঘনীভূত হতে থাকে। এই ক্ষোভ থেকে প্রাচ্যসমস্যা নতুন রূপ নেয়। এদিকে বলকান জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে ওঠে এবং বৃহৎ শক্তিগুলি অন্তরাল থেকে নানা ষড়যন্ত্রে মদত দিয়ে যুদ্ধের পরিবেশকে বাড়িয়ে যেতে থাকে। ১৯১৩ সালের জুন মাসে যুদ্ধ বাধে—একদিকে বুলগেরিয়া, অন্যদিকে সার্বিয়া, গ্রীস, রুমানিয়া ও মন্টেনিগ্রো। যুদ্ধ বেশি দিন চলেনি কিন্তু সেই সুযোগে তুরস্ক তার কিছু হৃত রাজ্যাংশ অধিকার করে নেয়। প্রাচ্য সমস্যা থেকে মহাদেশীয় যুদ্ধ হতে পারত। কিন্তু সাময়িকভাবে তা স্থগিত রইল।

৪.৪.৬ ওয়েল্টপলিটিক ও নৌ-বাদ

১৮৯০ সালে বিসমার্কের ক্ষমতাচ্যুতির পর থেকে জার্মান পররাষ্ট্রনীতিতে যে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমা দেখা দিয়েছিল তা ইউরোপের রাজনীতিতে যুদ্ধের পরিবেশকে ঘনিয়ে তুলেছিল। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম যে ওয়েল্টপলিটিক (Weltpolitik) ও নৌবাদের নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা ইউরোপীয় শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক হয়েছিল। ওয়েল্টপলিটিক (Weltpoltik) হল 'বিশ্বনীতি' ('World policy') আর নৌবাদ (Navalism) হল নৌবাহিনীর বিস্তার ও প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্বজলরাশির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা। ঐতিহাসিক গর্ডন ও ক্লেইগ (Gordon a. Craig, Germny1866-1945) ওয়েল্টপলিটিক, নৌবাদ (Navalism) ও বিশ্বযুদ্ধের আবির্ভাবকে সম্পৃক্ত ঘটনা বলে মনে করেন। ১৮৯৭ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে এই তিন ঘটনার সমন্বিত প্রভাব আত্মপ্রকাশ করেছে। ওয়েল্টপলিটিক বা বিশ্বনীতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জনৈক জার্মান ঐতিহাসিক বলেছেন যে এর পর থেকে জার্মানি বিশ্বমুখীন হল। 'World-policy' বা 'বিশ্বনীতি'র অর্থ, তাঁর মতে, হল 'জার্মানি তার নীতি নির্ধারণে ক্রমে ক্রমে ইউরোপ মহাদেশকে ত্যাগ করল' ("Germany has by degrees ceased to regard exclusively the continent of Europe in Framing her policy")। এই ইউরোপ ত্যাগ করে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার নীতি যে বিশ্বজয়ের স্বপ্নে বিভোর সম্রাটের উচ্ছ্বসিত ব্যক্তিত্ব থেকে উৎসারিত তা নয়। কিংবা কোন রাষ্ট্রবিদের (Statesman) উচ্চাভিলাষ ও অতিরিক্ত উৎসাহ থেকে সৃষ্ট এমন কথাও বলা যাবে না। একথাও বলা যাবে না যে রাজনৈতিক প্রভাবহীন অখিল জার্মান ঐক্যচিন্তায় মগ্ন কিছু মানুষের চাপের ফলেই তার সৃষ্টি। বিশ্বনীতির আদর্শকে বুঝতে হবে বিবর্তনের শক্তিশালী ধারায় যেখানে জার্মান রাষ্ট্র তার পুরানো নীতির সীমাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছে। ("...

rather, if forms part of that strong tide of evolution which irresistibly bore the German State out beyond the bounds of its earlier policy" —পঠিতব্য Cambridge Modern History XII.– এই খণ্ডে প্রাপ্য H. Oncken এর প্রবন্ধ The German Smpile)। বিসমার্ক মহাদেশের মধ্যে জার্মান রাষ্ট্রকে সীমাবদ্ধ রেখে অন্তত এই বোধ তৈরি করতে পেরেছিলেন যে জার্মানি বহির্বিশ্বে ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের কোন প্রতিযোগিতায় যাবে না। তাতে সনাতন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদির মনে কোন আশঙ্কার সৃষ্টি হয় নি। এইবার সেই আশঙ্কা ঘনীভূত হল। সমকালীন জার্মান রাষ্ট্রের একজন কর্ণধার প্রিন্স বুলো (Prince Bulow) স্বীকার করেছেন যে যখন বিসমার্কের পরবর্তী নীতিনির্ধারকরা বিসমার্কের মহাদেশীয় নীতির স্বীকৃত পথ ছেড়ে বিশ্বনীতির অনিশ্চিত পথে পা বাড়ালেন তখন "প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছিল" ("Voices were raised in protest")। এতে কোন সন্দেহ ছিল না যে আজ হোক কাল হোক জার্মানির সঙ্গে ইউরোপের মহাশক্তিগুলির সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে। এই অনিবার্য সংঘাতকে বিসমার্ক এড়িয়ে গিয়েছিলেন। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিগুলির জোট বাঁধার ইতিহাসকে সামনে রেখে জার্মানির এই 'লৌহ চ্যান্সেলর' (Iron Chancellor) বাড়াবাড়ি করার পথ থেকে বিরত হয়েছিলেন, শুধু তৈরি করেছিলেন ভিন্নতর এক জোট যাকে বলা যেতে পারে —লিপসন প্রমুখ ঐতিহাসিকদের ভাষায়—একটি আত্মরক্ষামূলক জোট। যদি কোন দিন ইউরোপীয় মহাশক্তিগুলির রোষ জার্মানির বিরুদ্ধে একটা আক্রমণাত্মক রাষ্ট্র জোট গড়ে তোলে তবে ত্রিশক্তির মৈত্রী (Triple Alliance) হবে জার্মানির রক্ষাকবচ। ইংল্যান্ড এই ত্রিশক্তির মৈত্রীকে প্রতিরোধ করেনি কারণ জানত তা ইউরোপের শান্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখবে। দীর্ঘদিন ধরে জার্মান রাষ্ট্রচিন্তায় সামরিকতা প্রাধান্য পাচ্ছিল। বিসমার্ক তাঁর সামরিক জাতীয়তাবাদকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পেরেছিলেন সেহেতু মহাদেশীয় রাজনীতির কোন বিপর্যয় কোথাও দেখা যায় নি। কিন্তু এইবার ওয়েল্টপলিটিকের বা বিশ্বনীতির নতুন গতি যখন জাতীয়তাবাদের আত্মম্ভরি ভাবনাকে উস্কে দিল তখন জার্মান সামরিকতা হয়ে দাঁড়াল "রাজনৈতিক গোলযোগের সবচেয়ে গতিশীল শক্তি" ("the most dynamic force for politicaldisturbance")।

ওয়েল্টপলিটিক (Weltpolitik) এর নীতি যে সব মাধ্যমগুলির মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের অন্যতম হল নৌবাদ (Navalism)। বিশ্বনীতি সার্থক করতে নৌবাহিনীর দরকার, আর নৌবাহিনী থাকলেই সমুদ্রে যাবার পথ দরকার হয়। ১৮৯৫ সালে কিয়েল ক্যানাল (Kiel Canal) খননের মধ্য দিয়ে উত্তর সাগরে যাওয়ার নতুন পথ তৈরি হল। এরপর থেকে বাল্টিক অঞ্চলের বন্দরগুলি থেকে যে কোন জাহাজের পক্ষে উত্তর সাগরে যাওয়া সহজ হয়ে উঠল। ১৯০০ সালেই রচিত হয়েছিল। জার্মান নৌ-আইন (German Navy Law)। এই আইন যে কোন মহাদেশীয় শক্তির নৌবহরের থেকে বড় নৌবহর তৈরি করার অধিকার ছিল জার্মানিকে। সেই সময়কার সবচেয়ে বড় নৌশক্তি ব্রিটেনের কাছে এইটি ছিল আশঙ্কার বিষয়। যে চ্যালেঞ্জ বিসমার্ক কোনদিন ইংল্যান্ডকে জানাতে সাহস করেন নি সেই চ্যালেঞ্জ অনায়াসে ইংল্যান্ডের সামনে হাজির করার দুঃসাহস দেখালেন বিসমার্কের উত্তরাধিকারীরা। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার ক্ষমতা ইংল্যান্ডের ছিল। সেই ক্ষমতার সুচারু সংগঠনের জন্য ইংল্যান্ডের প্রয়োজন ছিল আন্তর্জাতিক মিত্রের। উনিশ শতকের শেষ সিকিভাগ সময়ে ইংল্যান্ড সংরক্ষিত একাকীত্বের (isolation) মধ্যে ছিল। এই একাকীত্ব থেকে ইংল্যান্ড এইবার সরে এল। প্রথমে একটি এশিয় দেশ জাপানের সঙ্গে সে মিত্রতায় আবদ্ধ হল। পরে আঁতাত গঠন করল ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে। জার্মানির এই বিপজ্জনক বৈদেশিক নীতি ও নৌবাদের উদ্ভট চিন্তা যে শুধু কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের মস্তিষ্ক প্রসূত তা নয়। এর পেছনে বিদেশমন্ত্রী বার্নাড ভন বুলো (Bernard Von Birlow) এবং নৌ-মন্ত্রী গ্র্যান্ড এডমিরাল আলফ্রেড ফন টিরপিজ-এর (Grand Admiral Alfred Von Tirpitz) ভূমিকাও ছিল অনেক। বুলো একটি জবরদস্ত বৈদেশিকনীতিকে জার্মানির পালনীয় নীতি বলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "আমি বৈদেশিক নীতির উপরই সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছি — "I am putting the main emphasis on foreign policy। এ কথা তিনি

বলেছিলেন ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। তারপর আরও জোর দিয়ে বললেন "শুধুমাত্র একটি সফল বৈদেশিক নীতিই পারে মেলাতে, শান্ত করতে, একজোট করতে, ঐক্যবদ্ধ করতে" ("Only a successful foreign policy can help to reconcile, pacify, rally, unite– পঠিতব্য গ্রন্থ Rohl, Germany without Bismarck) । এইভাবে যখন বার্ণাড ফন বুলো জবরদস্ত বৈদেশিক নীতির কথা বলেছেন তখন তিরিপিজ (Tripitz) মনে মনে স্থির করছেন যে ইংল্যান্ডই হচ্ছে জার্মানির সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক শত্রু আর পৃথিবীতে ইংল্যান্ডের এই প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্য চাই যুদ্ধ জাহাজ। নৌবাহিনীর সফল অভিসার হিসাবে তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে এই বিশ্বাসে আরূঢ় করেছিল—এ কথা বলেছেন ঐতিহাসিক ক্রেগ। ("... and the experience sums to have confirmed him in the belief, first that Great Britian was Germany's Chief enemy and second, that the necessary instrument for countering British influence in the world was the battelship"–Gordon A. Craig, Germany 1866–1945) । স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল যে ইউরোপে দুটি শিবির আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে যে শিবিরের মধ্যে সমঝোতা সম্ভব নয়। ইংল্যন্ড স্থিতাবস্থা বজায় রাখার শিবিরের নেতা, অন্যদিকে স্থিতাবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে পরিবর্তনের বিপজ্জনক আকাঙ্ক্ষায় অধীর একটি সংশোধনবাদী (Revisioniest) শিবিরের নেতা জার্মানি। বিসমার্ক ই দুই শক্তিকে মুখোমুখী দাঁড় করাতে চাননি। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম তাই করলেন।

৪.৪.৭ প্রাচ্য সমস্যা ঃ সেরাজেভো হত্যা কাণ্ড ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা

১৯১৩ সালের আগস্ট মাসে বুখারেস্ট চুক্তির দ্বারা (Treaty of Bucharest) বুলগেরিয়ার সাথে অন্যান্য বলকান রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছিল। তুরস্ক আদ্রিয়ানোপল অধিকার করে নিয়েছিল এবং বুলগেরিয়া সেই বছর এপ্রিল মাসে লন্ডন চুক্তির দ্বারা যে সব অঞ্চলের অধিকার পেয়েছিল তা সব হারাল। সার্বিয়া আলবেনিয়া অধিকার করতে না পারায় ক্ষুব্ধ হয়েছিল ঠিকই কারণ কোন উপকূল রেখা সে লাভ করতে পারেনি। তবুও তার আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং পরিপার্শ্বের স্ল্যাভদের মধ্যে তার প্রতিপত্তি প্রায় সীমাহীন হয়ে পড়েছিল। অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী তার প্রতিবন্ধক হলেও তার আরও প্রসারিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত হয়নি। অস্ট্রিয়ার পেছনে দাঁড়িয়েছিল তার মিত্রশক্তি জার্মানি। জার্মানি চাইছিল না যে অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাক কারণ তাহলে বাগদাদ রেল ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বার্লিন থেকে মেসোপটেমিয়া ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে না। আবার তুর্কী সাম্রাজ্য না ভাঙলে সার্বিয়ার প্রভাব মণ্ডল বিস্তারের সম্ভাবনা স্তিমিত হয়ে যায়। পশ্চিম দিকে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী অনড় প্রহরীর মত সার্বিয়ার উপর নজর রাখছিল। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল করে এবং আলবেনিয়ার উপর সার্বিয়ার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত না হতে দিয়ে অষ্ট্রিয়া সার্বজনগণের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বেলে দিয়েছিল। এই প্রতিহিংসাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম প্রত্যক্ষ কারণ। কিভাবে এই প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয়েছিল তা নীচে বর্ণনা করা হল।

অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর শাসক ফ্রান্সিস জোসেপ (Francis Joseph) ১৮৪৮ এর বিপ্লবের সময় থেকে রাজত্ব করছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়েছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্দিনান্দ (Archduke Francis Ferdinnad) । তিনি ছিলেন উদার-নৈতিক মানুষ। তাঁর ইচ্ছা ছিল যখন তিনি শাসক হবেন তখন তিনি তাঁর সমস্ত প্রজাদের মঙ্গলজনক একটি নতুন সংবিধান দান করবেন । তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে তাঁর প্রজাদের অবস্থা দেখছিলেন। ১৯১৪ সালের জুন মাসে তিনি বসনিয়ায় যান। ২৮ জুন রবিবার তিনি যখন বসনিয়ার রাজধানী সোরাজেভোর (Serajevo) ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করা যায়। হত্যাকারী ধরা পড়েছিল। দেখা গেল যে বসনিয়ার মানুষ, অতএব অস্ট্রিয়ার প্রজা। কিন্তু অস্ট্রিয়ার পুলিশ অনুসন্ধান করে জানল যে হত্যার ষড়যন্ত্র সংগোপনে সার্বিয়াতে করা হয়েছে

এবং সার্বিয়ার সরকার পূর্বাহ্নেই তা জানত। অস্ট্রিয়ার সমস্ত রোষ গিয়ে পড়ল সার্বিয়ার উপর। জার্মানির সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে এবং রাশিয়া সার্বিয়াকে সমর্থন করলে সে কতখানি জার্মান মৈত্রীর উপর নির্ভর করতে পারবে তা স্থির করে ১৯১৪ সলের ২৩ জুলাই—ঘটনার প্রায় একমাস পরে—অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী সার্বিয়াকে একটি চরম পত্র (ultimate) দান করল। অস্ট্রিয়া জানত যে ১৯১১ সাল থেকে জাতীয়তাবাদী সার্ব বিপ্লবীরা 'ঐক্য অথবা মৃত্যু' ('Unity of Death') নামে একটি চরমপন্থী দল তৈরি করেছিল। এরা 'কালো হাত' বা Black Hand নামেও পরিচিত ছিল। সৈন্যবাহিনী থেকে সাধারণ মানুষ সবার মধ্যে এদের প্রভাব ছিল। এদেরই এক সদস্য যুবরাজকে হত্যা করে। অতএব অস্ট্রিয়া দাবি করল

১. সার্বিয়াকে অস্ট্রিয়া বিরোধী প্রচার ও কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে।

২. অস্ট্রিয়া যাদের নাম উল্লেখ করছে সেই সব অফিসার বা পদস্থদের চাকরির থেকে বরখাস্ত করতে হবে।

৩. সেরাজেভোর যে আদালতগুলি এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছে সেই আদালতগুলিতে অস্ট্রিয়ার প্রতিনিধি থাকবে।

সার্বিয়াকে উত্তর দেওয়ার জন্য আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিল। সার্বিয়া জানত তার উত্তরের উপর নির্ভর করবে ইউরোপের ভবিষ্যৎ শান্তি বা যুদ্ধ। কথা বুঝেই সার্বিয়া যতখানি সম্ভব অস্ট্রিয়ার দাবিপূরণের চেষ্টা করল। প্রথম দুটি দাবি সে তৎক্ষণাৎ মেনে নিল। তৃতীয় দাবি মেনে নিলে তার সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিতে হয়। অতএব তার প্রস্তাব হল যে সে আদৌ তার তদন্ত আদালতে বৈদেশিক কোন মানুষকে গ্রহণ করতে পারে কি না তা জানার মতামত জানা হোক। স্পষ্টতই সার্বিয়া তার যথাসাধ্য করেছে। এর বেশি কিছু করতে গেলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভারসাম্য নষ্ট হবে। একথা বুঝতে পেরে জার্মানি অস্ট্রিয়াকে সংযত হতে পরামর্শ দিল। এর আগেও অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে আক্রমণ করতে চাইলে জার্মানি তাকে নিরস্ত করতে চেয়েছিল এবং অস্ট্রিয়াও জানত যে জার্মানির সাহায্য ছাড়া বলকান অঞ্চলে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে বড় ঝুঁকি নেওয়া হবে কারণ যে কোন সার্বশক্তির পেছনে আছে রাশিয়া, সেবার জার্মানির পরামর্শমত কাজ করলেও এইবার অস্ট্রিয়া ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করল। সে জানত যে যদি কোন বড় যুদ্ধে সে জড়িয়ে পড়ে জার্মানি কিছুতেই আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। জার্মান সমর্থন সংকটকালে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে থাকবে এ কথা জানতে পেরেই গ্রাহ্য নয়। এই ঘোষণার সাথে সাথেই ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এর আগের দিনই রাশিয়া ঘোষণা করেছিল যে সে সার্বদের সমর্থন করবে। অতএব ২৯ জুলাই রাশিয়া তার সৈন্য সঞ্চালন শুরু করল। জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ১ আগষ্ট। ৩ আগষ্ট সে যুদ্ধ ঘোষণা করল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। ৪ আগষ্ট গ্রেট ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে সমস্ত ইউরোপ যুদ্ধের জালে জড়িয়ে পড়ল। এই সঙ্গে পৃথিবী অধিকাংশ জড়িত যুদ্ধের আয়োজন ও সংগঠনে অংশীদার হয়ে উঠল। ইটালী শুরুতে তার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করল। বুলগেরিয়া যোগ দিল কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের সঙ্গে। ৫১ মাস নিরন্তর যুদ্ধের পর কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের প্রতিরোধ ধসে যায়। ১৯১৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মিত্রশক্তি বুলগেরিয়াকে যুদ্ধবিরতি দান করল। তুরস্ককে যুদ্ধবিরতি দেওয়া হল ৩০ অক্টোবর, অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীকে ৩ নভেম্বর এবং জার্মানিকে ১১ নভেম্বর। এইভাবে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যুদ্ধ চলেছিল ৪ বছরের অধিক সময় ধরে। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্ব রাজনীতির ভারসাম্য নতুন করে রচিত হল। ইংল্যান্ড প্রথম থেকে চেষ্টা করছিল যুদ্ধকে সীমিত রাখতে। জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি, অস্ট্রিয়া সকলের কাছে ইংল্যান্ডের প্রস্তাব ছিল যে সার্বিয়ার প্রতি অতিরিক্ত রূঢ় হয়ে কেউ যেন ইউরোপীয় যুদ্ধের ঝুঁকি না নেয়। বলকান অঞ্চলের সমস্যা যেন বলকান অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে যেমনটি ছিল ১৯১২ ও ১৯১৩ সালের বলকান যুদ্ধের সময় তা নিশ্চিত করার জন্য ইংল্যান্ডের প্রস্তাব ছিল ইউরোপীয় দেশগুলির প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন হোক

যেখানে এ বিষয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারিত হবে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া জানাল যে নোরাজোভোহ ঘটনাটি অস্ট্রিয়ার নিজস্ব ব্যাপার, তা নিয়ে তারা অন্য দেশের উৎসাহকে গ্রাহ্য মনে করেন না। বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে সার্বিয়ার ব্যাপারে অস্ট্রিয়াকে স্বাধীন প্রয়াস নেওয়ার সুযোগ তারা করে দিতে চাইছিল। ইংল্যান্ডের শান্তি প্রয়াস প্রথমেই ব্যাহত হল। পরে যখন যুদ্ধ শুরু হল তখনও ইংল্যান্ড ফ্রান্স ও জার্মানির কাছে জানতে চেয়েছিল যে বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা (Neuatrility) মেনে নিয়ে তার অখণ্ডতাকে (integrity) তারা সম্মান জানাবে কিনা। এই বিষয়ে জার্মানি কোন সঠিক উত্তর না দিয়ে এ সাময়িকভাবে সমস্যাটি এড়িয়ে গেল। ২ আগস্ট জার্মানি লুকসেমবুর্গ (Luxemburg) এড়িয়ে গেল। ২ আগস্ট জার্মানি লুকসেমবুর্গ (Luxemburg) আক্রমণ করল এবং এর ঠিক পরেই জার্মানি বেলজিয়ামে তার সৈন্য প্রবেশ করাল। ব্রিটেন চিরকালই বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতাকে মর্যাদা দিয়ে এসেছে। ফলে ৪ আগস্ট মধ্যরাত থেকে অখণ্ডতাকে মর্যাদা দিয়ে এসেছে। ফলে ৪ আগস্ট মধ্যরাত থেকে জার্মানি আর ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। ইংল্যান্ড ঘোষণা করল যে সে যুদ্ধ করছে এই নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে কোন ছোট রাষ্ট্র অন্য কোন ক্ষমতাশালী বড় রাষ্ট্রের দ্বারা নিষ্পেষিত না হয়— "... we are fighting to vesidicate the principle that small nationalities are not to be crushed ... by the arbitrary will if a strong and overmastering Power"। অন্যদিকে জার্মানি ঘোষণা করল যে তারা তাদের শান্তিপূর্ণ শ্রমের ফসল, তাদের মহান অতীতের ঐতিহ্য এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য যুদ্ধ করছে— "We are fighting for the fruit of our peaceful labour, for the inheritance bequeathed to us by a great past, and for our future. শুধু তাই নয় এই ঘোষণায় আরও বলা হয়েছিল যে জার্মান জাতীয় জীবনে এক মহালগ্ন উপস্থিত হয়েছে, তার সেনাবাহিনী ছড়িয়ে গেছে রণাঙ্গনে, তার নৌবহর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত, আর তাদের সবার পেছনে রয়েছে জার্মান নীতি — "The great hour of trial for our nation has now struck ... our army is in the field, our flect is ready for action –and behind them, the entire German nation. এইভাবে জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা—জার্মানি ও ইংল্যান্ডের দুই বিপরীত দৃষ্টিকোণ নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতিভিত্তিক এই দুইয়ের লড়াই প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই থেমে থাকেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত তা গড়িয়েছিল।

৪.৪.৮ যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বেশীরভাগ লড়াই হয়েছিল ছয়টি প্রধান ক্ষেত্রে। এইগুলি হল পশ্চিম সীমান্ত (Westerm) — বেলজিয়াম উপকূলভাগ থেকে ফ্রান্স হয়ে সুইজারল্যান্ডের সীমানা পর্যন্ত দীর্ঘ কিন্তু অপ্রসারিত অঞ্চল; পূর্ব সীমান্ত (Eastern Front) বাল্টিক সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত অঞ্চল যা কখনো বেড়েছে, কখনো কমেছে অর্থাৎ পশ্চিম সীমান্ত থেকে অনেক স্থিতিস্থাপক অঞ্চল (a flexible line) ১৯৭৫ সালের ডারডানেলস (the Durdanelles in 1915) , স্যালোনিকা (Salonika) সমেত বলকান অঞ্চল (the Balkans, including Salonika) প্যালেস্টাইন ও বর্তমান যাকে ইরাক বলা হয় সেই অঞ্চল সমেত নিকট প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্য (the Near East, including Palestine and what is now Iraq) এবং অস্ট্রিয়া ইটলির সীমানা (theAustro-Italian border) । পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধ ছিল প্রায় নিশ্চল (static) কোন পক্ষই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দু-চার মাইলের বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। পূর্ব সীমান্তে জার্মান ও অস্ট্রিয়ানরা শুরুতে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। ১৯২৬ সালে রুশ সেনাপতি ব্রুশিলভ (Brussilov) অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৯১৭ সালে জারতন্ত্রের পতন হয় এবং বিপ্লবী সরকার শান্তিস্থাপন করতে চাইলে জার্মানি রাশিয়ার উপর রেষ্ট-লিটভস্কের (Brest-Litovsk) এর নির্মম চুক্তি চাপিয়ে দেয়। পূর্বসীমান্তে শান্তি ফেরে।

ডারডানেলস অভিযান উইনস্টন চার্চিলের (winston churchill) কল্পনাপ্রসূত। চার্চিল চেয়েছিলেন যে নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনীকে একসঙ্গে ব্যবহার করে দ্রুত কনস্টানটিনোপল অধিকার করে তুরস্ককে যুদ্ধের থেকে হটিয়ে দিতে যাতে রাশিয়ার উপর চাপ কমে যায়। কিন্তু তা করার জন্য নৌ ও স্থলবাহিনীর যে যোগাযোগ (Co-ordination) দরকার ছিল তা হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া নেতৃত্বেরও অভাব ছিল— সেই নেতৃত্ব যে দৃঢ়তা ও সাহস দেখাতে পারবে। ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ডার্ডনেলস্ (Durdanelles) অঞ্চল ত্যাগ করে চলে যায়। বলকান অঞ্চলে প্রথমে সার্বিয়া কিছুটা সাফল্য লাভ করেছিল কিন্তু পরে অস্ট্রিয়ান জার্মান ও বুলগেরিয়ান বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে সার্বদের প্রতিরোধ ভেঙে যেতে থাকে। ১৯১৮ সালে সার্বিয়া পরাজিত হয়।

নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে ব্রিটিশ ও তাদের মিত্রশক্তি প্রথম থেকে জয়লাভ করতে থাকে। তারা প্যালেস্টাইন থেকে তুর্কীদের হটিয়ে দেয় এবং মেসোপটেমিয়ার উপর তুর্কীদের প্রাধান্য ভেঙে দেয়। অস্ট্রিয়া ও ইটালির সীমানায় যুদ্ধের প্রথম দুবছর বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু ১৯১৭ সালে ইটালিয়ানরা ক্যাপেরিটো (Caporetto) নামক স্থানে ভীষণভাবে পরাজিত হয়। পরের বছর ভিক্টোরিও ভেনেটো (Vittorio Veneto) নামক স্থানে অস্ট্রিয়ানদের একইরকম ভাবে পরাজিত করে। আফ্রিকাতে জার্মানি টাঙ্গানাইকা ও জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সমেত তার উপনিবেশগুলিতে পরাজিত হয়।

১৯১৬ সালে ৩১শে মে ব্রিটিশ ও জার্মান নৌবাহিনী জুটল্যান্ড (Jutland) নামক স্থানে এক বিরাট জলযুদ্ধে লিপ্ত হয়, কিন্তু তার কোন বিশেষ ফলাফল হয়নি। যে কটি যুদ্ধ অনড় (Stalemate) ছিল এটি তার মধ্যে একটি। তবে এই যুদ্ধের পর জার্মান সামুদ্রিক বাহিনী (German High Seas Fleet) আর উত্তর সাগরে (North Sea) বা আটলান্টিক সাগরে (Atlantic Sea) প্রবেশ করতে সাহস করেনি। জার্মানি সামুদ্রিক যুদ্ধে ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। সে সাবমেরিন ব্যবহার করে যুদ্ধকে জলের তলায় নিয়ে গিয়েছিল। যে সব জাহাজ নানা খাদ্যসম্ভার ও রণসামগ্রী নিয়ে ইংল্যান্ডের দিকে অগ্রসর হত তাকে জলের তলা থেকে গোপনে আক্রমণ করত। ফলে ইংল্যান্ডে প্রধান প্রধান বস্তুর যোগান ও সরবরাহ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে, "জার্মানি ব্রিটেনকে প্রায় অনশনের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।" এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে ইংল্যান্ড কনভয় ব্যবস্থা (Convoy System) চালু করে আত্মরক্ষা করে। কনভয় ব্যবস্থা হল বাণিজ্যিক জাহাজ (Merchant ships) রিলে করে (in relays) যাবে আর চারপাশে তার নিরাপত্তা বিধান করবে যুদ্ধজাহাজ।

যুদ্ধের পরিণতিতে কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গ শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ইউরোপের বাইরে থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান মিত্রশক্তির সঙ্গে যুক্ত হলে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়, কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গ তাদের চাপ সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়ে। চীনে জার্মান উপনিবেশগুলি দখল করে নেয় জাপান। একইভাবে জার্মানির প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপনিবেশগুলি অধিকার করে নেয় অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সেনাবাহিনী। ১৯১৬ সালের মধ্যে জার্মানির আফ্রিকা-উপনিবেশগুলি সমস্তই ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে মিত্রশক্তি বাহিনী আফ্রিকায় লড়াই করছিল তাদের নেতৃত্বে ছিলেন দুই দক্ষিণ আফ্রিকার সেনাপতি দক্ষিণ-পশ্চিমে বোথা (Botha) এবং পূর্ব দিকে স্মাটস্ (Smuts)।

৪.৪.৯ জার্মানির নৌযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে জার্মানি ইংল্যান্ডকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছিল তার নৌবাদের (Navalism) প্রকল্প দিয়ে। অতএব নৌবাদের ফল জার্মান নৌবাহিনী কি রকম ফললাভ করতে পেরেছিল তা একটু জানা দরকার। যুদ্ধের শুরুতে জার্মানির বাণিজ্যিক জাহাজগুলি দেশের জন্য যথেষ্ট কাজ করেছিল। তখন তার সামুদ্রিক নৌবাহিনী কিয়েল ক্যানেলে (Kiel Canal) আটকে ছিল। জার্মানির লক্ষ্যই ছিল ইংল্যান্ড ও মিত্রশক্তির বাণিজ্যিক আক্রমণ করা এবং পূর্বদিকে যাবতীয় জলাশয়ে